কানাই তুমি খেইর খেলাও...

দিলরুবা শাহানা

পাঁচতলা লাইব্রেরীর তিনতলার জার্নাল সংরক্ষনের জায়গা থেকে বাইরে পা রাখতে রাখতে ফাইয়াজের মনে হল সে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। ঘড়ি দেখতে চেষ্টা করলো। কেমন যেন সবকিছু ঝাপসা লাগছে। বেশ কষ্টকর চেষ্টার পর বুঝতে পারলো আর মাত্র দেড় কি ঘন্টাদুই সময় হাতে আছে এর মাঝে তথ্য শুদ্ধ করে পাঠাতে হবে ওকে। এই সময়ের মাঝে সে ঘন্টাখানেকের রাস্তা পাড়ি দিয়ে শহরের আরেক প্রান্তে অবস্থিত অন্য লাইব্রেরীতে পৌঁছে দরকারী তথ্যটি খুঁজে পাবেকি? আবার যদি এখানকার মতোই ওখানেও আরেক দূর্ভাগ্য ওর জন্য অপেক্ষায় থাকে। ভয়ংকর চিন্তাটা ওর আপাদমস্তক কাঁপিয়ে দিল। লিফ্‌ট ভুলে গেল সে। দেখলো অজান্তেই সিড়ির কাছে চলে এসেছে। রেলিং ধরে ধীরে ধীরে নামছে। বিড়বিড় করে প্রাণপনে মনে করতে চাইলো 'পৃঃ ১৭১ নাকি ১৭৭?'। ওর এলোমেলো পা ফেলা আর বিড়বিড়ানি দেখে সিড়িভেঙ্গে উপড়ে উঠছে এমন একজন থমকে দাড়িয়ে জানতে চাইলো 'তুমি ঠিক আছতো ?' ও প্রশ্ন না বুঝে হাত নাড়লো। সিড়ি দিয়ে নামছে স্বপ্নভঙ্গের কষ্ট নিয়ে। তার এতদিনের হাড়ভাঙ্গা ও চোখব্যথা ধরানো কষ্টের ফসল নষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে সামান্য তথ্যের কারনে। এটা যদি পরীক্ষা হতো তবে একবার অকৃতকার্য হলে আবার দেওয়া যেতো। তার বছর দুই লাগিয়ে অনেক কষ্টে ও যত্নে তৈরী মেধার সন্তান প্রকাশের আলো থেকে বঞ্চিতই শুধু থাকবেনা গুণীজনের সামনে তার সততাও প্রশ্নের মুখোমুখী হবে। হয়তো মনে করা হবে ঐ জার্নালটি কখনোই সে হাতে নেয়নি, অন্য কারোর লেখায় পেয়েছিল তা থেকে টুকে নিয়েছে। এবার সততা হারানোর লজ্জায় জ্বর আরও তাঁতিয়ে উঠলো।

সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে আবারও বিড়বিড় করলো। সব টাইপ করে কমপিউটারের হার্ডডিস্কএ সংরক্ষণ করে হাতের লেখাগুলো ফেলে দিয়েছিল। কেন যে ফেলে দিল তা ভেবে এখন সীমাহীন আপসোস্। ভুল তারই হয়েছে। হয়তো হাতের লেখায় ১৭১ বা ১৭৭ ছিল সে লিখেছে ১৭।

প্রায় বছরের কাছাকাছি হয়ে গেছে সে পৃথিবীর নামকরা জার্নালে দুরুদুরু বুকে লেখাটি পাঠিয়েছিল। মাসচারেক পর প্রাপ্তি সংবাদ পায়। তারও ছয়মাস পর জানানো হল এডিটোরিয়াল বোর্ডএ বিবেচনার জন্য জমা দেওয়া হয়েছে। শেষ মেইলে তথ্যসংশোধনী পাঠানোর নির্দেশ। তবে মেইল খুলেছে সে বড় দেরীতে। তারপরও এই ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ার যুগে খবর যাতায়াত করে বিদ্যুতের গতিতে। তবে কথা হল সঠিক তথ্যতো হাতে থাকতে হবে। সেই সঠিক ও শুদ্ধ খবরটির জন্যই তার লাইব্রেরীতে আগমন। এখানেই চরম দূর্ভাগ্য তার জন্য অপেক্ষা করেছিল। দুঃখহতাশা আর লজ্জা তাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। বরিশালের

হাতেমআলী কলেজে সাদামাটা ভাবে পড়াশুনা করা ছেলেটির নিজস্ব ধ্যানধারনা পৃথিবীর নামজাদা জার্নালে আর বোধহয় ঠাঁই পাবেনা।

দরজা ঠেলে বাইরে এলো সে। প্রচন্ড ঠান্ডা আর ঝিরিঝিরি বৃষ্টি কুয়াশার মত ঝরছে। সে হাটছে বৃষ্টিতে। কোথায় যাচ্ছে জানেনা। বাসষ্টপ কোনদিক আন্দাজ করতে পারলোনা। চুল ভিজছে। ভিজা চুলের পানি গাল বেয়ে চিবুক থেকে কান্নার ফোটার মতো টুপ টুপ করে ঝরছে। তার মন চাইছে সে যেন এই বৃষ্টির ধারার সাথে গলে গলে যায়।

কোরানশরীফের সুরা মারইয়ামের ২৩নং আয়াত সে আওড়ালো। যে আয়াত মারইয়াম তাঁর কুমারিত্বের কলংক বিশ্বের বিস্ময় শিশুর জন্ম যন্ত্রণায় পীড়িত হয়ে আওড়াচ্ছিলেন। লজ্জায়, অপমানে লোকালয় ছেড়ে, আপনজনের ভালবাসার নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে যেতে যেতেও হয়তো পড়েছিলেন। হয়তো মরুভূমির তাপদগ্ধ বালিতে পুড়ে, সূর্যের অনলবর্ষিত তাপে ভিজে মারইয়ামের সেই বিখ্যাত প্রার্থনা চলছিল যার সারকথা হচ্ছে এর পূর্বে মৃত্যু হউক , মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত করা হউক তাঁকে।

তারপরের ইতিহাস প্রতিটি সচেতন মানুষের জানা। অদৃশ্য শক্তির লীলায় মারইয়াম বা মেরী মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ততো হনইনি, উল্টো বিরাট জনগোষ্ঠির হৃদয়ে রয়েছে গাঁথা তাঁর নাম।

সেই শক্তির বিচিত্র খেলায় বিস্মিত হাছনরাজা হাজারো বছর পর গানে গানে প্রশ্ন করেছেন

‘কানাই তুমি খেইর খেলাও কেমনে...’ ।

বরিশালের মামাবাড়ীতে স্বামী পরিত্যক্তা এক নারীর গর্ভে ফাইয়াজেরর জন্ম। কমবুদ্ধির বোকাসোকা সুন্দরী মেয়েটিকে কেনইবা বিয়ে করেছিলো আর বাপের বাড়ীও পাঠিয়ে দিয়েছিল তার কারন কখনো জানা যায়নি। এরপর আর কখনো নিতেও আসেনি তাকে, খোঁজ নেয়নি কোনো। বোকা মেয়েটি স্বামীকে বলারও সুযোগ পেলনা যে সে গর্ভবতী। হাসিখুশী অসম্ভব পরিশ্রমী মা তার ভাইদের সংসারে জীবন কাটিয়ে দিল। বোধবুদ্ধি কম বলে নিজের দুঃখের গভীরতাও টের পেতোনা সে।

ফাইয়াজ ছোটবেলা থেকে শান্ত আর লক্ষ্মী ছিল। মা নামাজ পড়ে ছেলের জন্য দোয়া করতো। আর স্বপ্ন দেখতো ফাইয়াজের বাবা কোন একদিন আসবে ওদের নিতে। সরলবোকা মেয়েটিকে সবাই খুব ভালবাসতো, ওকে দুঃখ দেওয়ার কথা কেউ ভাবতেই পারতোনা। তাই স্বামী একদিন আসবেই এই স্বপ্ন তার কেউ কোনদিন ভেঙ্গে দেয়নি। অর্থ জানতোনা তবুও সে সুরা মারইয়াম পড়তে ভালবাসতো। ফাইয়াজকেও শুনিয়েছে মাঝেসাঝে। যদিও ফাইয়াজ এর কিছুই বুঝেনি। বড় হয়ে আরও শান্ত ও বোঝদার হয়ে গেল সে। বাড়ীর বাজার করা থেকে নিজেদের গাছের ডাব বিক্রি সব কাজ বিশৃঙ্খতার সাথে করে। মাকে খুব ভালবাসতো তবে বাবার কথা ও কখনোই জানতে চায়নি। এরমাঝে স্কুল শেষ। চারমাইল দূরে হাতেম আলী কলেজে ভর্তি হল।

মামা ঢাকাতে চাকরী করেন। এক শীতে বাড়ী ফিরে বললেন ‘আশ্চর্য কান্ড শুন! ফাইয়াজের এক চাচা অফিসে এসে হাজির। ওরা সব খবর রেখেছে। ফাইয়াজের কথা তার মায়ের কথা সব সব জানে।’
মামী জানতে চাইলো
‘ওর বাবা কোথায়?’
‘সেইতো আসল খবর, কি বলছি শোন, ফাইয়াজের মায়ের দোয়া কাজে লেগেছে।’
বাবা ওকে নিতে আসছেন বিদেশ থেকে। ওকে চাচার কাছে ঢাকায় পৌঁছে দিলেন মামা। পাসপোর্ট ইত্যাদি করতে মেলা সময় লাগবে তাই আগেই চলে আসা। বিশৃঙ্খ লক্ষ্মীমত ছেলেটির বাড়ী ছাড়ার সময়ে ওর জন্য মামী আঁচলে চোখ মুছলেন। বোকা মা শুকনো মুখে হাসি নিয়ে বললো,
‘তুই এখন যা, পরে এসে আমাকে নিয়ে যাবি, ঠিক আছে।’
বিদেশ থেকে ফেরার পথে প্লেনেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় বাবার। মৃত রিয়াজ রহমানকে দেখে কোন আলোড়ন হয়নি ওর মনে। তবে সঙ্গে আসা বাবার স্ত্রী এমিলি লারকিন ওর ভালবাসা জিতে নিলেন। সেই রমণীও অপত্য স্নেহে জড়িয়ে ওকে সঙ্গে নিয়ে নিজ দেশে ফিরলেন।
বছর চারেকে ফাইয়াজকে ইংরেজী শিখিয়ে পড়াশুনার জন্য তৈরী করলেন এমিলি। অসম্ভব ধৈর্যের সাথে শুধু পড়তে লিখতে নয় বলতে ও শুনে কিভাবে বুঝতে হয় শিখালেন। পরীক্ষাগুলো ফাইয়াজ পাশ করলো কোনমতে। শিক্ষাবর্ষের শেষে যে লং এ্যাসে বা দীর্ঘ রচনা সে লিখলো তাও যে খুব প্রশংসা পেল তা বলা যায়না। তবে ঐ প্রবন্ধে ওর নিজস্ব চিন্তাবহনকারী কিছু বাক্যাবলী বিদ্যুতের মত ঝল্সে উঠেছিল। পুরোপুরি গবেষণা নির্ভর উচ্চশিক্ষার সুযোগ সে পেল। এমিলি বুঝলো এই ছেলে ঝক্ঝকে্ ইমারত বা গাড়ীর মডেল বানিয়ে বিরাট জনগোষ্ঠির দৃষ্টি কাড়বেনা ঠিকই তবে কাদাবালি মেখে জলাশয় ছেনে ঝিনুক তুলবে তাতে একদিন না একদিন মুক্তো থাকবেই।
ফাইয়াজ একদিন ইংরেজী কোরান শরীফ নাড়াচাড়া করে দেখছিলো। এমিলি জানতে চাইলো
‘কিছু খুঁজছো নাকি?’
‘তেমন কিছু না তবে সুরা মারইয়ামটা পড়তে চাই একবার।’
‘দাড়াও, বের করে দিচ্ছি, আগে পড়েছ বোধহয়,’
‘কখনোই না, তবে মা পড়তো’
এমিলির বিস্ময় জাগলো ভেবে যে ঐ বুদ্ধিহীনা মহিলা সুরা মারইয়াম পড়ে কি বুঝতো কে জানে।
‘তোমার মা অর্থ বুঝতো?’
আনমনা ফাইয়াজ উত্তর দিল
‘সম্ভবতঃ না।’

এমিলির সাথে স্নেহের সম্পর্কটা ধীরে ধীরে গভীরতো হলই তারপরে অসমবয়সী দু'জন পরস্পরের ভাল বন্ধুও হয়ে গেল। এমিলি ফাইয়াজের বাবার চেয়েও সাতবছরের বড়। ফাইয়াজের বাবার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হিসেবে ভাল পসার ছিল আর ছিল বিলাসী ধাঁন্ধাবাজ পোলিশ স্ত্রী। ঐ মহিলার ফাঁদ থেকে বেরুনোর জন্য রাস্তা বাতলে দেওয়ার পরামর্শ চাইতে আইনজীবী এমিলির কাছে যাওয়া। এমিলির পরামর্শে সে বাংলাদেশে যায় ওখানেই পোলিশ বউকে তালাক দিয়ে দেয়। এরমাঝেই ওরই পরামশমর্ত সমস্ত সম্পত্তি ফাইয়াজের নামে করে ফেলে। তবে তার একুশবছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত দেখভালের দায়িত্ব থাকে এমিলির। সবকিছু ঘটে ফাইয়াজের অজ্ঞাতে। সেই সময়ে ফাইয়াজের বয়স ছিল দশ কি এগারো। সেই পোলিশ মহিলা বাংলাদেশ পর্যন্ত যায়। আইনী লড়াইয়ে সে শুধু জিতে আনে আদালত নির্ধারিত দেনমোহরানা।
সব ঝামেলা সাঙ্গ হলে পর এমিলি আর রিয়াজ বিয়ে করে ফিরে আসে এখানে। ফাইয়াজ জানতে চেয়েছিল
'আমার মায়ের কথাতো জানতেই, তাছাড়াও তুমি কি মুসলমান হয়েছিলে?'
'তোমার মা-বাবার মাঝেতো সম্পর্কই ছিলনা আর কিতাবিয়াকে(গ্রন্থে বিশ্বাসী)কে মুসলমান হওয়ার দরকার পড়েনা।'
কথা শেষে সে ফাইয়াজকে 'জাতোই বনাম জাতোই'* মামলাটি পড়তে দেয়। নুরুদ্দিন জাতোই তার বাবারই মত মারিনাকে লন্ডনে বিয়ে করে। তারপর পাকিস্তানে ফিরে এসে তালাকনামা পাঠিয়ে দেন। মারিনা পাকিস্তানে এসে আদালতে তালাককে চ্যালেঞ্জ করে। কিছুই হয়নি তাতে। দেনমোহর নিয়ে ফেরত যেতে হয় তাকে। তবে বিয়েটি বৈধ বলেই দেনমোহর তার প্রাপ্য এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
ফাইয়াজের মনে আরও একটি বিষয়ে কৌতুহল জাগে তা হল এমিলির মদে নিরাসক্তি কি তার বাবার সংস্পর্শের কারণে?
'শোন মদ মুসলমানের জন্য নিষিদ্ধ ছিলনা প্রথমে। তবে যখন দেখা গেল মদই তাদেরকে খেয়ে ফেলেছে তখনি তা নিষেধ করা হয়। আর আমি নিজেই মদকে আমার জন্য নিষিদ্ধ করেছি, আমার প্রতি সম্মান দেখিয়ে তোমার বাবাও পরে আর মদ ছুঁয়নি।'

এমিলিকে একদিন সে বলেছিল
'আমি কত হতভাগা ভেবে দেখেছ, দু'জন মানুষ ভালবেসে তাদের সন্তানকে পৃথিবীতে আবাহন করে আর আমি আমার বাপের কাছে অনাকাঙ্খিত ছিলাম, ভাবলে কষ্ট হয়!'
আস্তে আস্তে সস্নেহে ওর হাত চাপড়ে এমিলি বলেছিল
'তুমি তোমার মায়ের কাছে ছিলে কাঙ্খিত, তুমি তার জন্যে এনেছ life's most special pleasure which never happened to me !'

এমিলির ভেজাস্বর ফাইয়াজকে এমনভাবে ছুঁয়ে গেল যে সেও আপনসন্তানের মত তার হাত জড়িয়ে ধরে তাকে স্বস্থি দিতে চাইলো।

এমিলি জাতে আইরিশ। তার মদাসক্ত বাবা মাতাল হয়ে তার স্ত্রীকে খুন করেন স্কটল্যান্ডের ছোট্ট এক গ্রামে। তখন তার বয়স ছিল মাত্র সাত। বাবা এমনিতে খারাপ লোক ছিলেন না তবে মদের প্রভাবে অন্যরকম হয়ে যেতেন মূহূর্তে। এমিলির চিরকুমারী এক আত্মীয়া ঐ লোকালয় থেকে অনেকদূরে তাকে নিয়ে লন্ডনে আসেন। যেখানে কেউ তাকে চেনেনা তাই তার ভয়ংকর অতীতও কেউ জানবেনা।

'অন্যকেউ নাইবা জানুক আমিতো জানি আমার অতীত, মদে আমার ভয় আর ঘৃনা আমি তাড়াতে পারিনা।'

একটু চুপ করে থেকে বলেছিল

'সার কথা হল মানুষ যদি নিজেই নিজের আচরন নিয়ন্ত্রণ করতে পারতো তবে তারজন্য ধর্মের অনুশাসনও দরকার হতোনা, জেলখানাও লাগতোনা মনে হয়, কি বল?'

ওর জীবনগাঁথা শুনে ফাইয়াজের এমিলির জন্য সহানুভূতি আরও বেড়ে গেল। মনে হল ওর মা এমিলির মতো অতো দুখী নয়। স্বামীর উপেক্ষা, অবহেলা পেয়েছে মা তার। তবে মানুষের বিভৎস রূপ দেখার গ্লানি নিয়ে তাকে বাঁচতে হচ্ছেনা। যৌবনের উত্তাপে ফাইয়াজের বাবার দায়িত্ববোধ আর নীতিনৈতিকতা পুড়ে ছাড়খাড় হয়ে গেলেও ফাইয়াজের তা হয়নি। ফাইয়াজ ওর একুশ বছর পূর্ণ হওয়ার পর দেশেও গিয়েছে ক'বার। মায়ের জন্য প্রায় সব স্বাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করেছে। মামামামী ফাইয়াজের যথেষ্ঠ মনোযোগ পাচ্ছেন। ফাইয়াজ বিশ্বাস করে অর্থবিত্ত দিয়ে স্নেহ ও ভালবাসার ঋণ শোধ হয়না। তাই মায়ের প্রতি ভালবাসা যেমন তেমনি মাতৃস্নেহে বেঁধে রাখা এমিলির জন্যও দরদ তার অপরিসীম।

আজ বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে মনে হচ্ছে কত অপ্রয়োজনে মানুষ কত তুচ্ছ অন্যায় করে যা অন্য কাউকে চরম বিপাকে ফেলে। আজকের ঘটনায় সে স্থম্ভিত, দুঃখীত। ইনটেলেকচ্যুয়াল প্রপার্টি জার্নালের পাতাগুলো কে কেটে নিয়ে গিয়ে তাকে এমন বিপদে ফেললো? কে? কে? এমন নীচ কেমন করে হয় মানুষ? এই জার্নালগুলো লাইব্রেরীর বাইরে নেওয়া যায়না। তাইবলে এমন চুরির কৌশল করতে হবে। তার কোন ধর্ম ছিল কি? এইরকম অন্যায়ের জন্য কাউকে কি জেলে পুরা যায়? আজ এমিলি বেঁচে থাকলে হয়তো বলতো ধর্ম আর জেলখানা মানুষকে মানুষ করতে পারেনা যদি তার অন্তরে বিবেক মরে যায়।

বাসষ্টপে লোকটি জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিল কতঘন্টা কে জানে। সজ্ঞানে পথিকেরা সবে তাকে মাতাল ভেবে পাশ কাটিয়ে গেল। রাত বাড়লো, বৃষ্টি আরও অঝোরধারায় ঝরলো। একসময়ে কিভাবে যেন খবর পেয়ে হাসপাতালের

এ্যাম্বুলেন্স এসে লোকটিকে তুলে নিয়ে গেল। স্বজনহীন সেই মানুষটি নিউমোনিয়াতে একদিন হাসপাতালের বিছানাতেই মারা গেলেন।

শীত তখন শেষ হয়ে আসছে। গাছে ফুলপাতা প্রস্ফুটিত হয়নি, পাখিরাও উড়েনি আকাশে তখনো। মৃতকে কবরে নামানো হবে এমনি সময়ে অজানা কোন একদেশ থেকে একঝাঁক ছাইরঙা পাখি হালকা লালরঙা ডানা মেলে উড়ে এলো। ঠোঁটে করে বয়ে নিয়ে আসা বইয়ের পাতা ঝরিয়ে দিল কফিনের উপর। সব পাতার ক্রমিকসংখ্যা ১৭১ আর তাতে লিখা ছিল ‘কানাই তুমি খেইর খেলাও কেম্‌নে...’।

*PLD(Pakistan Law Digest) 1967